চৈতন্যের চেয়ে এগার বছরের বড় ছিলেন নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। চৈতন্যর (১৪৮৬-১৫৩৪ খ্রিঃ) সঙ্গে ঘর পালনো অবধূত নিত্যানন্দের মিলন হয়েছিল নবদ্বীপে। বীরভূমের বীরচন্দ্রপুরে হাড়াই বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্মাবতীর (বাবা-মা) ঘরে নিত্যানন্দের জন্ম হয় ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের মাঘি পূর্ণিমায়। বাল্যবেলায় বারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বীরচন্দ্রপুর তথা খলৎপুর তথা একচক্রীনগরীতে অবস্থান করেছেন। তারপর অজানা-অচেনা এক সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন দেশ ভ্রমণে। তাঁর এই তীর্থভ্রমণ শুরু হয়েছিল বীরভূমের বক্রেশ্বর থেকে। তারপরই তিনি হয়েছেন সেই সাধুর সঙ্গছাড়া। এবং ঘুরেছেন একা একা। পরবর্তী জীবনে তিনি কোনওদিন আর বীরচন্দ্রপুরে আসেননি। একবার মাত্র চৈতন্যের দীক্ষান্তে তাঁর সঙ্গে রাঢ় ভ্রমণে এসেছিলেন সিউড়ির কাছে পানুড়িয়া গ্রাম পর্যন্ত।

অন্যদিকে চৈতন্য তাঁর জীবন কালের (৪৮ বছর) শেষ চব্বিশ বছর কাটিয়েছেন পুরীতে। প্রথম ২৪ বছর তাঁর কেটেছে শিক্ষা নিয়ে। বড় মাপের পণ্ডিতও হয়ে উঠেছিলেন তিনি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্য বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নিত্যানন্দের উপর। নিত্যানন্দের উপর বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম প্রচারের সে দায়িত্ব যথাযথ পালিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য সৃজন করেছিলেন 'দ্বাদশ গোপাল' 'দ্বাদশ উপগোপাল' সহ বহু বৈষ্ণব নেতৃত্বের। তাঁদের সবার সহযোগেই তিনি ভাগীরথীর দুটি তীর বরাবর এবং সমগ্র রাঢ়বঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র বারো বছর বয়সে সে অর্থে তিনি বীরভূম জেলা তথা বীরচন্দ্রপুর ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈষ্ণব সমাজের 'মা-গোঁসাই' জাহ্নবা দেবী এবং তাঁর সুযোগ্য সন্তান বীরচন্দ্র অবশ্য বীরচন্দ্রপুর এসেছিলেন এবং সেখানে বাঁকারায়ের সেবা-আরাধনার সুব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন বেদ-বিধির কাঠিণ্যমুক্ত বাউলসমাজের, নেড়ানেড়ি সম্প্রদায়ের।

আবার নিত্যানন্দ বীরভূমের বীরচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি কিন্তু তেমন প্রভাবশালী বৈষ্ণব-প্রচারক তথা (দ্বাদশ) 'গোপাল' বা (দ্বাদশ) 'উপগোপাল'-দের একজনকেও বীরভূম থেকে তুলে আনতে পারেননি। আসলে সে সময় বীরভূমে জৈনের নাথ এবং বৌদ্ধের শেষ-অবশেষ তন্ত্রেই মেতেছিল এ জেলার সাধারণ মানুষজন। জঙ্গলমহল জুড়ে বেড়েছিল ডাকাতিও। কাজেই সহজে একাজ করার মতোন সামর্থ অর্জন করা যায়নি। হয়তো তেমন সময়ও দিতে পারেননি এ জেলার জন্য চৈতন্য-দিশারী মানবপ্রেমিক নিত্যানন্দ। তবে তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মৃদঙ্গ বাদক 'গণ' ধনঞ্জয় পণ্ডিতকে বীরভূম তথা রাঢ়বঙ্গে বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিত ছিলেন নিত্যানন্দ প্রবর্তিত দ্বাদশ গোপালেরও অন্যতম একজন 'গোপাল'।

জলন্দির পাটবাড়ি

আদিত্য মুখোপাধ্যায়

আজ্ঞা হইল তাঁর প্রতি
ভাসাইতে রাঢ়ক্ষিতি
সংকীর্তন প্রেমের বন্যায়।

১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কাছে 'জাড়গ্রামে' জন্মগ্রহণ করেন ধনঞ্জয় ঠাকুর। পিতা শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মা কালিন্দী দেবী। ১৩ বছর বয়সে এই ধনঞ্জয়ের প্রথম বিয়ে হয় হরিপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তানাদি ছিলনা। এই সন্তানের কামনাতেই নাকি চৈতন্য নির্দেশেই বেশ কয়েকজন বৈষ্ণব-নেতৃত্ব বয়সকালে পুনর্বিবাহ করেছিলেন। ধনঞ্জয় পণ্ডিত তাঁদের মধ্যে একজন। যদু চৈতন্য, তাঁর সন্তান রাধাবিনোদের সেবা প্রকট করেছিলেন।

ধনঞ্জয়ের দ্বিতীয় বিয়ে হয় শীতলগ্রামে। যদুচৈতন্য সম্ভবত তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। ধনঞ্জয় ঠাকুর নিত্যানন্দের কাছে নবদ্বীপে দীক্ষা নেন এবং গুরুর সঙ্গেই পানিহাটি দণ্ডমহোৎসব এবং বৃন্দাবনেও ধর্মপ্রচারার্থে যান। নিত্যানন্দের ছায়াসঙ্গী এই 'গোপাল' বর্ধমানের শীতলগ্রাম-সাঁচড়া-পাঁচড়া থেকে মানবপ্রেম প্রচারের জন্য জলন্দি আসেন। বোলপুর থেকে 'বঙ্গছত্র' (ব্যাঙচাতড়া) বাসে, তারপর দু'কিমি পথ রিক্সায়। বর্তমানে নানুর থেকে প্রধানমন্ত্রীর সড়কযোজনার পাকা পিচরাস্তা জলন্দি গ্রামের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে 'বঙ্গছত্র' চলে এসেছে। দু'একটি বাসও চলছেও রাস্তায়। তবে বোলপুর থেকেই যাওয়া সহজ। ৬/৭ মাইল রাস্তা, গাড়িও যায়।

এই জলন্দি গ্রামে এসে বীরভূম জেলার প্রথম শ্রীপাটটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আনুমানিক ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রতি রাঢ়দেশে প্রেমধর্ম প্রচারের দায়িত্ব ছিল। সম্ভবত পানিহাটির 'দণ্ডমহোৎসবের' পর জলন্দিতে এসেছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ধনঞ্জয় পণ্ডিত। তখন তাঁর কণ্ঠে থাকত নিত্যানন্দ-প্রদত্ত 'নৃসিংহদেব শালগ্রাম শিলা।' সেই শালগ্রাম নিয়েই জলন্দিতে তাঁর সন্তান (মতান্তরে ভাই সঞ্জয়ের সন্তান) যদু চৈতন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাবিনোদের সেবা এবং মন্দির। এটি আজ একেবারে ধ্বংসের মুখে। যদু চৈতন্যের চার-পাঁচটি সন্তান। যাঁদের মধ্যে জয়রাম (জ্যেষ্ঠ) ছিলেন জলন্দি এবং এবং কোমাতেও। দ্বিতীয় পরশুরাম, ইনিও কোমা এবং জলন্দিতে ছিলেন। আসলে দু'জনের স্থায়ী অবস্থান নিয়ে আজও দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। তৃতীয় গঙ্গারাম ওরফে ভৃগুরাম ওরফে লালজী গোঁসাই। তিনি অবশ্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এবং যত্রতত্র অবস্থান করেছেন। কনিষ্ঠ কানুরাম বা রামকানাই, যিনি মুলুকগ্রামে শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অপরাজিতার পুজো প্রকাশ

করেছেন। ইন্দ্রগাছার (অমরহরি মণ্ডল) একজন লেখক 'বামাকালীর' প্রতিষ্ঠাতা মনিরামকেও যদু চৈতন্যের সন্তান বলেছেন এবং তিনি নাকি মুলুকের রামকানাই-এর চেয়ে বড়। সেই সূত্রে মনিরাম চতুর্থ সন্তান। কিন্তু তাঁর যুক্তি বা তথ্য একটি গান মাত্রই। যার শুরু – "রাম, রাম, রাম, রাম ও রামকানাইয়ের – / বারটি রাখালের মাঝে ও রামকানাইয়ের।" গানটি নাকি সাধক মনিরামের রচনা এবং আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রগাছার বামাকালী পুজোয় ভক্তরা এই গানটি সমস্বরে গেয়ে থাকে। 'সাধক মনিরাম ও ইন্দ্রগাছা' পুস্তিকায় অমরহরি মণ্ডল বলেছেন – "সাধক মনিরামের দেহাবসানের সম্ভাব্য সময় ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭২ বৎসর। তাঁর মরদেহটি মন্দিরের মধ্যে বেদীর নীচে এখনও শায়িত অবস্থায় আছে। তিনি কোন ভক্তকে দীক্ষা দেননি।" এ তথ্যেরও তেমন কোন সমর্থন সূত্র নেই। যেমন গানটিতে চার বার 'রাম' বলার পর 'রামাকানাই' নামটি আসাতেই তিনি ভেবে নিলেন যদুচৈতন্যের পাঁচ সন্তান ছিল। আসলে এই বিষয়টিতে আরও গ্রহণযোগ্য তথ্য ও যুক্তির সন্নিবেশ প্রয়োজন। বৃহৎ বৈষ্ণব সাহিত্যের কোথাও-ই মনিরামকে যদুচৈতন্যের সন্তান হিসেবে দেখা যায় না। তবে যদুচৈতন্য যে ধনঞ্জয় ঠাকুরেরই সন্তান এ ভাবনায় কোনও কষ্টকল্পনার প্রয়োজন নেই। বেশি বয়সে ধনঞ্জয় বিয়ে করেছেন এবং বিয়ের পর তিনি 'সঞ্জয়' নাম গ্রহণ করেছেন। এইই সত্য।

নিত্যানন্দের জীবিতকালেই ধনঞ্জয় পণ্ডিত শ্রীপাট প্রতিষ্ঠা (অনুঃ ১৫২০ খ্রিঃ) করেছিলেন জলন্দি গ্রামে। বলা বাহুল্য এটিই বীরভূম জেলায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট। আসলে পানিহাটির 'দণ্ডমহোৎসব' তথা বৈষ্ণব মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন দ্বাদশ গোপালেরা নিত্যানন্দের ছায়াসঙ্গীর মতোই ছিলেন। তারপর সেখান থেকেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন দিকে দিকে। নিত্যানন্দ প্রদত্ত 'নৃসিংহদেব শিলা' প্রথমে এবং পরে রাধাবিনোদের সেবা শুরু করেন তিনি জলন্দি গ্রামে দণ্ডমহোৎসবের কিছুকাল পরেই।

জেলার প্রথম পাটবাড়ি থেকেই জাতিপংক্তিহীন উদারনীতি প্রচাতির হয়েছে সমগ্র বীরভূমে। রাজা সামন্ত শেখরের জলন্দায় গড়ের হিংসার কেন্দ্রভূমি জলন্দিতে অহিংস বৈষ্ণবের প্রেমধর্ম প্রচার করেছেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত এবং তাঁর উত্তরপুরুষেরা এই পাটবাড়ি থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে ভাণ্ডীরবন, কোমা, মুলুক, মঙ্গলডিহি, মাড়গ্রাম, তেজহাটি, পুরন্দরপুর, খয়রাশোল, ষাটপলসা প্রভৃতি বৈষ্ণব সেবা স্থানগুলি। মূলত বীরভূম জেলায় বৈষ্ণবের প্রেম ও মানবধর্মের প্রচার, তন্তুজীবীদের দীক্ষা দান, এমন কী বহু ডাকাতকেও উদ্ধার করেছিলেন এই ধনঞ্জয় পণ্ডিত। এবং তা এই জলন্দির পাটবাড়ির কেন্দ্র হতেই। বর্তমানে এই পাটবাড়িটি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। সংরক্ষণের অভাবে মন্দিরটি ভেঙে পড়তে বসেছে। যদুচৈতন্যের বংশধরেরা নানান হিংসার কারণে বোলপুর-জব্বলপুর বা আরও অন্যকোথাও প্রতিষ্ঠিত। পুজোপাটের সেবা কাজে শুরু হয়েছে ভাঙনের ভাটা। কেউ দেখবার নেই! পাঁচশো বছরের প্রাচীন মন্দির অথচ তা সংরক্ষিত হয়নি 'হেরিটেজ' আইনে। মাঘ মাসের প্রথমে অতীতে এখানে 'রাধাবিনোদের মেলা' হত, এখন হয়না। ধূ-ধূ পড়ে আছে 'মেলাতলার মাঠ'! তার নাম মোছেনি এতটুকু। এখন দোলের আগের দিন এই মেলাতলার মাঠেই 'চাঁচড়ের মেড়া' পোড়ানো হয়। সেদিন পাল্কিতে করে রাধাবিনোদ বিগ্রহ গ্রাম-পরিক্রমা করেন, রাধারানি অবশ্য আসেননা। জলন্দিতে রাধাবিনোদ মন্দিরের পশ্চিমেই একটি ছোট্ট ডোবা আছে, নাম 'বিনোদচুয়া'। এখানেই ঠাকুরের বাসনপত্র ধোয়া-মাজা হয়। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখি পূর্ণিমা তারিখে সংস্কার হয়েছিল এই পাটবাড়ি। সেই মর্মে একটি ট্যাবলো-ফলক আটানো আছে মন্দিরের দেয়ালে। কংসারি ঠাকুর খুজুটিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি তাঁর বাবা নলিনাক্ষর নামে এই ফলকটি তৈরি করান এবং রাধাবিনোদ মন্দিরের সংস্কার করান। কংসারি ঠাকুরের ছেলে ডি-পি-এল-এর প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ার রঞ্জিত ঠাকুর, তিনিও এখন গ্রামে থাকেন না। প্রয়াত ফণিভূষণ ঠাকুরের স্ত্রী অন্ধ-অথর্ব সরোজিনী ঠাকুর (৮৬) তাঁর বোবা অবিবাহিত মেয়ে সুনীতিকে (৬২) নিয়ে জলন্দিতে রয়েছেন। তাঁরাও পাটবাড়ির অংশীদার! তবে পুজোপাটের প্রায় সবটা দায়িত্বই সামলাচ্ছেন নরেন ঠাকুর (৭৬)। রাধাবিনোদের জন্যই গ্রামের নাম 'শ্রীপাট জলন্দি' যেদিন প্রথম এই পাটবাড়ি দেখেছিলাম, সেদিন বেড়ায় ঘেরা শুকনো উঠোনে সুউচ্চ গুলঞ্চের গাছে একগাছ সাদা তারার মতো ফুল, সামনে পরিস্কার টিনের আটচালা, ভেতরে মূর্তি-শালগ্রাম। সে মুগ্ধতার ছবি আজও আমার দু'চোখে আঠার মতো আটকে আছে। তারপরও গেছি জলন্দিতে 'রক্তখেগো' ভক্তদের গাজন দেখতে। জলন্দির গাজন (১লা বৈশাখ) বেশ অন্যরকম। তবে হিংসার আগুনে আজও জ্বলছে জলন্দি।

জলন্দি ছিল পাল যুগে সামন্ত শেখরের গড়। দুর্গ। জলন্দার গড়। কথিত আছে এই হিংস্র রাজা সামন্ত শেখরকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন দেবপালের সেনাপতি নবসেন। নবসেনকে কোন কোন লেখক লাউসেন-ও বলেছেন। তবে সে ধর্মমঙ্গলের নায়ককে নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি আজও। যুদ্ধে সামন্ত শেখরকে পরাজিত করে তিনি নাকি তাঁর কন্যা তারা-কে তৃতীয় পত্নী হিসেবে বিবাহও করেছিলেন। রাঢ়-বীরভূমে ১৫২০-১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৈষ্ণবের সহিষ্ণুতা এবং মানবধর্ম প্রচার করেছিলেন ধনঞ্জয় ঠাকুর। অহিংস-প্রেমের মন্ত্রে আকর্ষণ করেছিলেন বীরভূমি আমজনতাকে। এবং তা এই জলন্দির পাটবাড়ির কেন্দ্র হতেই। যে পাটবাড়ি নির্মিত হয়েছিল ঘুড়িষার লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরেরও আগে। যা আজ নিতান্ত অবহেলায় আড়াল খুঁজছে অন্ধকারের।